একজন সাইফুর রহমান

মাবরুর মাহমুদ

আইএফডি স্পেশাল আর্টিকেল ২

সেপ্টেম্বর ৫, ২০১০

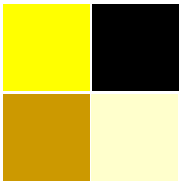

সাবেক অর্থমন্ত্রী মরহুম এম সাইফুর রহমানের
প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত

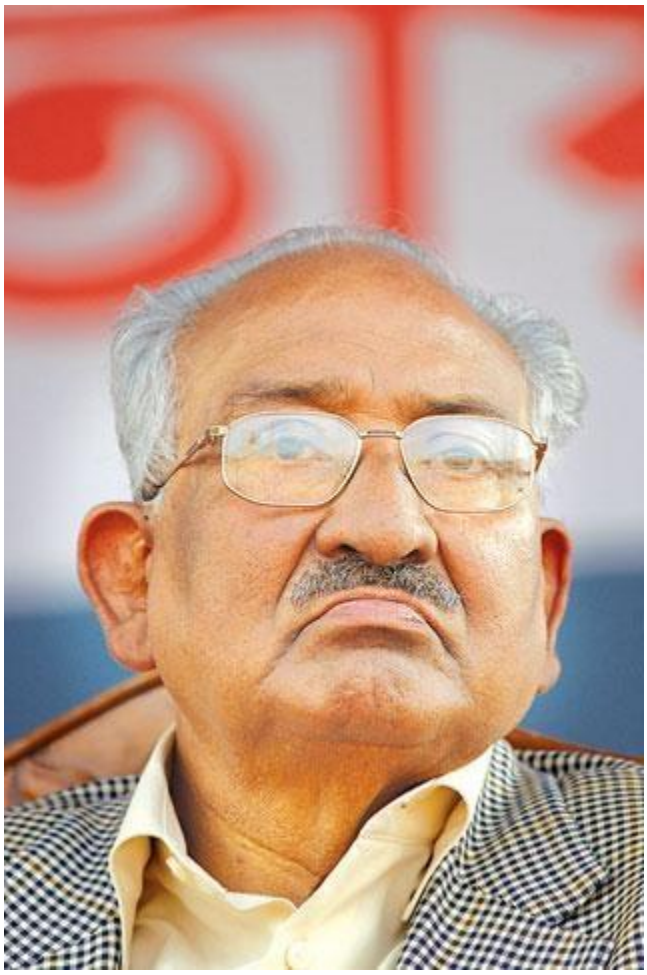

[এই রচনার সকল মন্তব্য এবং যে কোন ভুল ভ্রান্তির জন্য লেখক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। এর জন্য অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দায়ী নয়]

একজন সাইফুর রহমান

সাবেক অর্থমন্ত্রী এবং বিরোধী দল বিএনপির অন্যতম প্রধান নেতা মরহুম এম সাইফুর রহমানকে নিয়ে এই স্পেশাল আর্টিকেলটি লেখার ইচ্ছা আমার দীর্ঘদিনের। আমার মনে প্রবল ইচ্ছা ছিল এই আর্টিকেলটি তার জীবদ্দশাতেই কোন একটি বাজেটের প্রাক্কালে প্রকাশ করার।

বাংলাদেশে একটি অদ্ভুত রেওয়াজ আছে।

আমরা সাধারণত কোন গুণী ব্যক্তির গুণকে তার জীবদ্দশাতে স্বীকার করতে চাইনা। আমরা মনে করি, আমরা যদি পরের গুণকে প্রকাশ্যে স্বীকার করে ফেলি, তাহলে আমার নিজের অবস্থান জনসমক্ষে ছোট হয়ে যাবে।

এর পিছনে আরো বড় কারণও রয়েছে। আমরা আসলে জাতিগতভাবে অসম্ভব পরশ্রীকাতর। এই কারণে কোন প্রকার স্বার্থ ছাড়া কেউ কারো গুণ সবার সাথে আলোচনা করেন না। ফলে কেউ যদি হঠাৎ নিঃস্বার্থভাবে কারো গুণাবলী আলোচনা করে ফেলেন, তাহলে সকলেই ধরে নেন এই প্রশংসাকারীর নিশ্চয়ই কোন মতলব বা স্বার্থ রয়েছে। না হলে লোকটা এই গুণী ব্যক্তির প্রশংসা করছে কেন?

এই গুণী ব্যক্তি যদি হন কোন ক্ষমতাধর ব্যক্তি তাহলে তো কথাই নেই। সকলেই নিঃসন্দেহে ধরে নেবেন নিশ্চয়ই প্রশংসাকারী ব্যক্তি প্রশংসিত ক্ষমতাধর ব্যক্তির কাছ থেকে সুবিধা বা টাকা পেয়েছেন।

এই কারণে আমাদের সমাজে কোন প্রকার স্বার্থ ছাড়া অপরের প্রশংসাসূচক কোন বক্তব্য সাধারণত দেয়া হয়না। আর স্বার্থ যদি না থাকে, তাহলে সেই গুণী ব্যক্তির কোন প্রশংসা তার জীবদ্দশাতে কেউ করেন না।

তাই এই নিংস্বার্থ প্রশংসাসুচক বক্তব্যগুলি দেয়া হয় মুলত গুণী ব্যক্তির মৃত্যুর পর।

যখন তিনি সকলের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবেন, যখন তার কাছ থেকে আর কোন স্বার্থসংশিষ্ট দেনা-পাওনার হিসাব নেয়ার আর কোন সুযোগ থাকবে না কিংবা এই ধরণের কোন অভিযোগ করার কোন অবকাশ থাকবে না, তখন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই গুণী ব্যক্তির বিভিন্ন গুণ বিভিন্ন ফোরামে ধীরে ধীরে প্রকাশ করবেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল, যে ব্যক্তি মরে গেছে, যার কবরে এখন ঘাস উঠে গেছে, সেই ব্যক্তি এই গুণের প্রশংসা শুনে কি করবেন?

আমাদের জাতীয় মানসিকতার এই বৈকল্য সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়ে ধরা দেয় বিভিন্ন জাতীয় পুরস্কার দেবার বেলায়। তখন দেখা যায় অধিকাংশ পুরস্কৃত ব্যক্তি ইতিমধ্যেই মৃত। তারা পুরস্কার পেয়েছেন মরণোওর। এই সকল ব্যক্তিরা তাদের মহৎ কাজের স্বীকৃতি তাদের জীবদ্দশাতে আদায় করতে পারেননি। আর যারা পেরেছেন, তাদের অধিকাংশের পিঠেই লেগে যায় দলীয় সীল। কারণ সকলেই ধরে নেন, দলীয় লোক না হলে এই ব্যক্তি তার জীবদ্দশাতে এই স্বীকৃতি কি করে আদায় করল? তার তো সেটা পাওয়ার কথা নয়।

কিন্তু প্রশ্ন হল, মরণের পরে একটি সোনার মেডেল, ক্রেস্ট এবং এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে মৃত ব্যক্তির আত্মা কি করবেন, কোথায় যাবেন?

তবে কিছু কিছু ব্যক্তি রয়েছেন যাদের প্রশংসা মরণের পরেও করা নিষেধ। এরা হলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

এই দুই ব্যক্তির যে কোন একজনের প্রশংসা করলেই আপনি শেষ। আপনার ললাটে তখন হয় আওয়ামী পন্থী কিংবা বিএনপি পন্থী লেবেলটি সাটানো হয়ে যাবে। আপনি আর জীবনেও এই লেবেল তুলতে পারবেন না।

সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

তার মৃত্যুর পর তার অর্থনীতি চালানোর দক্ষতা নিয়ে যে সকল মন্তব্য বিভিন্ন মহল থেকে উঠে এসেছে, তা তার জীবদ্দশাতে কখনো প্রকাশ্যে কেউ স্বীকার করেননি। করেছেন মৃত্যুর পর। তার জীবদ্দশাতে তার নীতি নির্ধারণের দক্ষতা নিয়ে কাউকে আমি কোন প্রকার কোন আর্টিকেল লিখতে দেখিনি, কিংবা টিভির কোন টকশোতে এই ব্যাপারে আলোচনা করতে শুনিনি। হতে পারে এই রকম আলোচনা হয়েছে, কিন্তু আমি তা মিস করেছি। তবে আমি নিশ্চিত, এই ধরণের প্রশংসা যদি হয়েও থাকে, তা সাইফুর রহমানের প্রাপ্যের চেয়ে অনেক কম।

যাই হোক এম সাইফুর রহমানের জীবদ্দশাতেই এই আর্টিকেল প্রকাশ করার আমার প্রবল ইচ্ছা কোন কাজে আসেনি। আমি এই আর্টিকেলটি লেখার চিন্তাভাবনা শুরু করি তার মৃত্যুর আগে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ করেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

তাই আমরা আসলে ভাবি এক, আর হয় আরেক।

আইএফডি'র এই স্পেশাল আর্টিকেলটি লিখতে গিয়ে মরহুম এম সাইফুর রহমান রচিত **"কিছু কথা কিছু স্মৃতি"** শীর্ষক আত্মজীবনী থেকে কিছু অংশ নেয়া হয়েছে। সেই সাথে তার কর্মদক্ষতা এবং স্টাইল নিয়ে আমার কিছু নিজস্ব মন্তব্যও স্থান পেয়েছে। আমি এই রচনাতে এমন কিছু বিষয় আলোচনা করেছি যা সাইফুর রহমান সম্পর্কে পাঠকদেরকে নতুন চিন্তার খোরাক যোগাবে।

তবে এটা বলা দরকার এই রচনাটি সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের কোন মূল্যায়নধর্মী রচনা নয়। আমি তার কাজের মূল্যায়ন করার কেউ নই।

মি. এম সাইফুর রহমান এমন এক সময়ে দেশের অর্থনীতির হাল ধরেছিলেন যাকে বলা যেতে পারে বাংলাদেশের একটি টার্নিং পয়েন্ট। আগামীতে বাংলাদেশ হয়তো অনেক দুর এগিয়ে যাবে। অনেক উন্নত হবে। কিন্তু এই উন্নয়নের ভিত্তি যে তৈরি করেছিলেন এক দেশপ্রেমিক ব্যক্তি, তা হয়তো কেউ মনে রাখবে না। তাই সাইফুর রহমানকে আমরা যাতে ভুলে না যাই, সেই উদ্দেশ্যেই আইএফডি'র এই স্পেশাল আর্টিকেল।

বিদেশীদের স্বীকৃতি

বাংলাদেশের যে কয়জন ব্যক্তিত্ব আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান হয়েছেন, তাদের প্রায় সকলের ক্ষেত্রে একটি বিষয় খুব কমন। ব্যাপারটি হল, তাদের ভাল কাজের স্বীকৃতি যখন তারা বিদেশীদের কাছ থেকে পাওয়া শুরু করেছেন, তখনই দেশের সবার টনক নড়েছে। তার আগে তাদের কথা দেশের ভিতরে কেউ খুব একটা মূল্যায়ন করেননি।

সাইফুর রহমানও এর ব্যতিক্রম নন।

তিনি যদিও কোন আন্তর্জাতিক পুরষ্কারে ভূষিত হননি, তারপরও তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন বিশ্বব্যাংকের বোর্ড অফ গভর্নরসের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হয়ে। সেই সাথে তিনি তার বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রশংসা পেয়েছেন একাধিক বিদেশী ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে। সাইফুর রহমান যে দুইজন বিশিষ্ট বিদেশী ব্যক্তির প্রশংসার কথা তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে ইউএসএ'র সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন অন্যতম।

তার আত্মজীবনীর ১৩৫ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, *"আমি একবার ওয়াশিংটনে ওয়ার্লড ব্যাংকের একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। বক্তৃতা দিয়ে আমি যখন মঞ্চ থেকে নেমে আসি তখন আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মি. বিল ক্লিনটন আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেন – Minister, Hearty congratulations. You have made tremendous progress in children's education and girls education. That is I should owe. No democracy will be stable until people are educated. And you have got your proverty – the fundamental mover of the poverty is to make the people free from ignorance. Now you will see, how you will go fast. You are doing well."*

আবার আত্মজীবনীর ১১৪ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, *"আমাকে যখন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের চেয়ারম্যান করা হলো, ইন্ডিয়ান ফাইন্যান্স মিনিস্টার ড. মনমোহন সিং (এখন প্রধানমন্ত্রী), তিনি আমার অফিস থেকে দুই ব্লক পরে ছিলেন তখন আমার অফিসে আসেন, আমার হোটেলের ওয়ার্ল্ড ব্যাংক অফিসে। তিনি আমাকে বলেন, Mr Finance Minister. I came*

all the way from my office to personally extend you my heartiest congratulations for being elected as the Chairman of the Board of Governors of the World Bank. We are proud of it. Bangladesh should be proud. It is a pride for South Asia. 40 years before India once elected Chairman of the Board of Governors of the World Bank in 1954. No South Asian since then elected as Chairman."

মুক্তবাজার অর্থনীতির সিদ্ধান্ত নিয়ে তা দ্রুত বাস্তবায়নের যে পদক্ষেপ তিনি নিয়েছিলেন, তার জন্য প্রাপ্ত প্রশংসার কথা বলতে গিয়ে তিনি তার আত্মজীবনীর ১৩৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, *"আমি খালেদা জিয়ার প্রথম সরকারের সময় (১৯৯১-৯৬) অনেক যেমন মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালু করতে পারি, যেটা ইন্ডিয়াতে করতে পারলো না। ড. মনমোহন সিং সিঙ্গাপুরে দেখা হলে বললেন My collague has done in Bangladesh economic reforms to a substantial extent. But I could not do it in India because of the opposition. যদিও তিনি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ওয়াশিংটনেও তিনি তিনি আমার কাছে অনুরূপ মন্তব্য করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানান।"*

ড. মনমোহন সিং তখন ছিলেন অনেক 'বড়' দেশের অনেক 'বড়' অর্থমন্ত্রী। তিনি অর্থনীতিতে পিএইচডি ধারী একজন অর্থনীতিবিদ। আর মরহুম সাইফুর রহমান ছিলেন অনেক 'ছোট' দেশের অনেক 'ছোট' অর্থমন্ত্রী। তিনি অর্থনীতিবিদ নন। একজন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট। কিন্তু তাই বলে ড. মনমোহন সিং তারই পেশার একটি ভাল কাজের স্বীকৃতি অন্য পেশার লোককে দিতে কোন দ্বিধা বোধ করেননি।

আমার কেন জানি মনে হয়, মরহুম সাইফুর রহমান যদি বিশ্বব্যাংকের চেয়ারম্যান মনোনীত না হতেন, তাহলে দেশের ভিতরে তার মুল্যায়ন হত অন্যরকম। তাকে আর আমরা তখন খুব একটা মেধাবী মনে করতাম না। ফলে পান থেকে চুন খসলেই তার উপর বইত সমালোচনার ঝড়। তাকে যে এই ঝড় খুব একটা পোহাতে হয়নি, তার জন্য সর্বপ্রথম ধন্যবাদ দেয়া উচিত বিদেশীদেরকে।

জিয়াউর রহমানের সাহচর্য

সাইফুর রহমানের জীবনের একটি অন্যতম দিক ছিল তিনি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের খুবই ঘনিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন এবং জিয়াউর রহমানের সাথে তার টুকরো টুকরো অসংখ্য স্মৃতি রয়েছে।

এই স্মৃতিগুলো পড়লে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিত্বের নানাদিক যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি বোঝা যায় প্রেসিডেন্ট জিয়া সাইফুর রহমানকে কতটুকু মূল্য দিতেন।

যেমন জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যোগদানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি তার আত্মজীবনীর ১৯০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "*প্রেসিডেন্ট জিয়া শোনেন যে funeral এ যোগ দেয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট কার্টার আসবেন, ফিলিপাইনের ফার্স্ট লেডি মার্কোস আসবেন, আরও কিছু সরকার প্রধান আসবেন। এ তথ্যটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব সামসুল হক প্রেসিডেন্ট জিয়াকে জানান। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট কার্টারের সাথে তো আগে আপনার দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। এখানে আপনার দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রেসিডেন্টের সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আর কি কথা হয় আমি জানিনা। রাত আটটার দিকে প্রেসিডেন্ট আমাকে টেলিফোন করে বলেন, Mr Finance Minister, would you take me as your companion in Japan? উনি আরো বললেন, আপনারা ফাইন্যান্স মিনিস্টাররা অত্যন্ত Lucky. দু'দিন পর পর আপনারা বিদেশ চলে যান। ওয়াশিংটন, জেনেভা, লন্ডন, টোকিও - বিশ্বের সব যায়গায় আপনারা যান। As a President my opportunity is limited. I can not go anywhere as and when I like. আমার কোথাও যাওয়ার scope নাই unless some President invites me and there is a genuine cause. আর আপনারা সপ্তায় সপ্তায় বিদেশ যান! I wish, I was a Finance Minister, and not a President. আমি তখন রসিকতা করে বলি। Finance Minister হওয়ার জন্য আপনি যুদ্ধ করেছেন? তাহলে Presidency চলবে কি করে? যাহোক, আপনি যেতে চান? উনি বললেন, হ্যাঁ। আমি তো যেতে চাই। প্রতিনিধি দলের নাম তো তাদের কাছে আগেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। I would like to add myself as a member of the delegation. আমি বললাম, ডেলিগেশনে আপনার নাম শুধু যোগ হবে না, You will be leading the delegation. এভাবেই তিনি জাপান গেলেন। উনি আমাদের সঙ্গী হতে*

চেয়েছিলেন, আমরা উনার সঙ্গী হলাম। দেখেন, প্রেসিডেন্ট জিয়া কত সুন্দরভাবে কথাগুলো বলেন।"

আমরা প্রেসিডেন্ট জিয়া সম্পর্কে আজকের রচনায় আলোচনা করলাম কারণ প্রেসিডেন্ট জিয়ার সরাসরি সাহচর্যে ছিলেন, এই ধরণের ব্যক্তির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। তাই সংশ্লিষ্টদের কাছে আমাদের অনুরোধ, তারা যেন এই ধরণের টুকরো টুকরো স্মৃতি বইয়ের আকারে কিংবা একটি ডকুমেন্টারি ফিল্মের আকারে রেকর্ড করে রাখেন। এতে অন্তত নিশ্চিত হওয়া যাবে যে আজ থেকে শত বছর পরেও আমাদের নতুন প্রজন্ম ইতিহাসের এই মহানায়ককে সঠিকভাবে চিনতে ভুল করবে না।

সাইফুর রহমানের জেলজীবন

মি. সাইফুর রহমান তার জীবনে জেল খেটেছেন মোট দুইবার। প্রথমবার ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় এবং দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট এরশাদ যখন ক্ষমতা দখল করেন, তখন। প্রথম জেল জীবনের মেয়াদ ছিল দুইমাসের মত। তবে দ্বিতীয় জেল জীবনের মেয়াদ ছিল আরো বেশি, প্রায় নয় মাস।

দ্বিতীয় জেল জীবনের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি তার আত্মজীবনীর ১১৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, *"জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা নিলেন (১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ)। ক্ষমতায় এসে উনি আমাকে গ্রেফতার করে জেলে পুরলেন। আট-ন'মাস আমাকে জেলে রাখলেন। আমি বার বার জিজ্ঞাসা করেছি, আমাকে কেন জেলে নেওয়া হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। আসলে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ ছিলো না। আমার স্ত্রী মাঝে মাঝে গিয়ে আমার সাথে দেখা করতেন। আমাকে এ্যারেস্ট করার পর বিভিন্ন ধরণের দুর্নীতির তদন্ত করা হয় - সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার সার্কিট হাউজে তদন্ত করা হয়েছে আমার নামে কোনো বিল বাকি আছে কিনা তা দেখার জন্য। আমার নামে কোনো কিছুই বাকি ছিলো না। আমার বিরুদ্ধে কোনো কিছুই তারা পায়নি। ফলে কোনো অভিযোগ তারা দায়ের করতে পারেনি।"*

আমি এখানে এই ঘটনাটি উল্লেখ করলাম এই জন্য যে প্রেসিডেন্ট এরশাদ অবৈধ পন্থায় ক্ষমতা দখল করেছিলেন। কিন্তু তার পরও তিনি একজন ক্ষমতাহীন ব্যক্তিকে নয় মাসের বেশি বিনা বিচারে জেলে আটক রাখেননি।

অথচ এখন ক্ষমতাহীন অনেক ব্যক্তিবর্গ বিনা বিচারে মাসের পর মাস এমনকি বছরের পর বছর জেলে আটক আছেন যদিও এই সরকার কোন অবৈধ সরকার নয়। তারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত বৈধ সরকার।

সরকারের কর্তা ব্যক্তিদের কাছে তাই আমাদের বিনীত অনুরোধ, তারা যেন বিনা বিচারে আটক এই সকল ব্যক্তিদের বেলায় উপরের **'এরশাদ স্ট্যান্ডার্ট'** টি স্মরণ রাখেন এবং সেই মত একটি নির্দিষ্ট সময় পর এই সকল দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে জেল থেকে ছেড়ে দেন।

এখানে বলা দরকার, সাইফুর রহমানকে জেলে পুরলেও পরবর্তীতে সাবেক প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ সিলেট সফর করতে গিয়ে মরহুম সাইফুর রহমানের বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ করেন এবং ঢাকায় ফিরে এসে তিনি তাকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি সুন্দর চিঠি লেখেন। সাইফুর রহমান এই চিঠির একটি কপি তার আত্মজীবনীতে প্রকাশ করেছেন।

তিনি তার আত্মজীবনীতে মাত্র তিন জন দেশি ব্যক্তির প্রশংসাসূচক চিঠি প্রকাশ করেছেন। এরা হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সাবেক প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ, এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পক্ষে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মো. সামসুল হক। হতে পারে তিনি আরো অনেক দেশি ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে একই রকম অভিনন্দন পেয়েছেন, কিন্তু তা তিনি প্রকাশযোগ্য মনে করেননি। আবার এটাও হতে পারে, তার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে এই তিন জন দেশি ব্যক্তি ছাড়া আর কোন ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে একই রকম অভিনন্দন তিনি আর পাননি।

সাইফুর রহমানের বাণী

পরশ্রীকাতরতা ছাড়াও আমাদের জাতিগত আরো একটি দুর্বলতা রয়েছে। আমরা সাধারণত নিজেদের আশেপাশের ব্যক্তিবর্গের বাণীকে মূল্যবান মনে করি না। আমরা যখন

ছোটবেলায় ‘অধ্যবসায়’ রচনাটি মুখস্থ করেছি, তখন দেখেছি অধ্যবসায়ের উদাহরণ দিতে গিয়ে অধিকাংশ সময়ই পশ্চিমা বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের জীবন থেকে উদাহরণ দেয়া হয়েছে।

আমার মনে পড়ছে এমনই একজন ব্যক্তি ছিলেন *রবার্ট ব্রুস*। তিনি স্কটিশ শাসক ছিলেন এবং শত্রুর সাথে বার বার পরাজিত হয়েও তিনি দমে যাননি। অবশেষে সপ্তম মোকাবেলায় তিনি যুদ্ধে জয়ী হন।

আমার মত আরো যারা কৈশোরে ‘অধ্যবসায়’ রচনাটি মুখস্থ করেছিলেন তারা নিশ্চয় রবার্ট ব্রুস সাহেবকে এক নামে চেনেন।

একইভাবে ‘সময়ের মূল্য’ রচনাটি মুখস্থ করতে গিয়ে দেখেছি সেখানে বিভিন্ন মনীষীদের সময়ের মূল্য দেয়ার যে সকল উদাহরণ রয়েছে, তার অধিকাংশ মনীষীই পশ্চিম বিশ্বের ।

কিন্তু প্রশ্ন হল, আমাদের কি তাহলে এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন না যারা জীবনে কোন অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত রাখেননি?

আমাদের সমাজে কি অতীতে এমন কোন জ্ঞানী মনীষীর জন্ম হয়নি যারা সময়ানুবর্তিতার প্রতি খুব মনোযোগী ছিলেন না?

হ্যা ছিলেন। এই ধরণের ব্যক্তি আমাদের সমাজে যুগে যুগে এসেছেন, এখনো রয়েছেন।

কিন্তু আমরা তাদের অধ্যবসায় কিংবা সময়ের মূল্যের উদাহরণ কখনো টানিনা কারণ আমাদের মধ্যে জাতিগত সেই আত্মবিশ্বাস নেই। আমরা মনে করি, আমাদের আশেপাশে যে সকল সফল ব্যক্তি রয়েছেন, তারা আসলে কেউই আন্তর্জাতিক মানের নন।

কিন্তু এই ধারণা ভুল।

আমাদের সমাজে এখনো অনেক জীবিত ব্যক্তি রয়েছেন যাদের অধ্যবসায় কিংবদন্তিতুল্য। এমন অনেক কৃষকের সন্তান রয়েছেন, যারা সুদীর্ঘকাল দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আজ নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং খ্যাতিমান হয়েছেন। অথচ তাদের অধ্যবসায়ের কথা আমরা কখনো মুখ ফুটে বলি না। একইভাবে অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তি রয়েছেন যারা তাদের জীবনে সময়ের সঠিক মূল্য সব সময়ই দিয়েছেন, এখনো দিচ্ছেন।

আমরা এই ধরণের অসুস্থ ধারার পরিবর্তন চাই।

তাই আমাদের চারপাশে যে সকল ব্যক্তি মূল্যবান কথাবার্তা বলেছেন এবং বলছেন, তা আমরা মাঝে মাঝে সবার সামনে তুলে ধরব। এতে অন্তত বোঝা যাবে, আমাদের সমাজেও আন্তর্জাতিক মাপের দার্শনিক এবং জ্ঞানী ব্যক্তিত্বের কোন অভাব নেই।

আজ আমরা মরহুম সাইফুর রহমানের দুটি বাণী তুলে ধরছি। আমরা মনে করি এই দুটি বাণী খুবই মূল্যবান এবং সকলেরই তা পড়ে দেখা উচিত।

বাণী ১ঃ সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার ছাড়া বহু বছরের অর্থহীন ও নীরস জীবনের চেয়ে এক মুহূর্তের বীরত্ব অনেক বেশি মূল্যবান।

বাণী ২ঃ ‘প্রত্যেক মানুষ তার নিজের জন্য’ – এ ধরণের মানসিক প্রবণতা পরিণামে সমাজের সবার জন্য দুর্ভোগ ডেকে আনে।

সাইফুরিও স্টাইল

সাইফুর রহমান তার জীবদ্দশাতে সময় সময় বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী বক্তব্য দিতেন কোন প্রকার তথ্য উপাত্তের বিশ্লেষণ না করেই। তিনি কোন অর্থনীতিবিদ ছিলেন না, ছিলেন একজন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট। তার অর্থনীতিতে কোন ডিগ্রী ছিল না। তাই তিনি তার অর্থনীতি বিষয়ক বিষয়াদি বিশ্লেষণ করতেন তার নিজস্ব স্টাইলেই।

যেমন একবার তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশের জিডিপি’র প্রবৃদ্ধির হার নাকি আসলে যতটা মনে হয়, বাস্তবে নাকি তার চেয়েও অনেক বেশি। তার এই মন্তব্যের সমর্থনে কোন

প্রকার তথ্য উপাও না দেয়াতে তখন তার অবস্থান নিয়ে অনেকে বাঁকা মন্তব্যও করেছিলেন।

তার নেয়া মুক্তবাজার অর্থনীতির সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এই সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তিনি কোন বিষদ গবেষণা করেছিলেন কিনা, তা আমার জানা নেই। এই ব্যাপারে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদরা আরো ভাল বলতে পারবেন। তিনি যদি তা না করে থাকেন, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, কোন প্রকার গভীর গবেষণা ছাড়াই তিনি এতো বড় সিদ্ধান্ত কি করে নিলেন?

আসলে মি. সাইফুর রহমান এই ধরণের সিদ্ধান্ত বা বক্তব্য দেয়ার ক্ষেত্রে তার ইনট্যুশন (Intuition) ব্যবহার করতেন। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে *ইনট্যুশন* শব্দটির যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা হল, An idea or a strong feeling that something is true although you cannot explain why। অর্থাৎ, আপনি বুঝতে পারছেন কোন একটি বিষয় সঠিক কিন্তু তা কেন সঠিক তা আপনি বোঝাতে পারছেন না।

এই ধরণের ইনট্যুশন থেকে সিদ্ধান্ত নেয়ার নজির বহির্বিশ্বে আরো অনেক রয়েছে।

যেমন চায়নার ভিশনারি নেতা দেং জিয়াও পিং যখন সমাজতন্ত্র থেকে সরে এসে চায়নার একাংশে মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখন কি তিনি তার আগে মোটা মোটা গবেষণা পেপার পড়েছিলেন?

তিনি যদি তা না পড়ে থাকেন, তাহলে তিনি কি করে বুঝলেন এই সিদ্ধান্তটি নিলে চায়নার জন্য লাভ হবে? তিনি কি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে এই সিদ্ধান্তের কারণে চায়না অতি দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে কিংবা চায়না একটি বিশ্ব পরাশক্তিতে পরিণত হবে?

শুধুমাএ ইনট্যুশনের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেয়ার নজির সারা বিশ্বের বিজনেস ওয়ার্ল্ডে একটি খুবই সাধারণ এবং মামুলি ঘটনা।

যেমন, বিল গেটস যখন মাইক্রোসফট তৈরি করেন, তখন তার পণ্যের বাজার ছিল খুবই সীমিত। কিন্তু তারপরও তিনি তার সকল মেধা, সময় এবং অর্থ ব্যয় করেছিলেন শুধুমাত্র মাইক্রোসফট বিনির্মাণের জন্য। তিনি যদি এই বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা আগাম যাচাই করতেন, তাহলে তিনি কোন উত্তর পেতেন না। কারণ যে পণ্য মানুষ এখনো ব্যবহারই করেনি, সেই পণ্যের বাজার ভাল হবে, নাকি খারাপ হবে, তা আগেভাগেই তিনি বুঝবেন কি করে?

ইনট্যুশনের উপর নির্ভর করে ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেয়ার নজির বাংলাদেশেও রয়েছে।

২০০৪ সাল নাগাদ ইন্ডিয়ার ধনকুবের মি. রতন টাটা যখন বাংলাদেশে ৩ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাবটি সই করেন, তখন এই বিনিয়োগের ব্যাপারে গভীর কোন গবেষণা তার হাতে ছিল না।

সমঝোতা স্মারক সই করার পর টাটা তাদের বিশ্লেষক দল বাংলাদেশে পাঠায় এবং এই বিনিয়োগগুলির সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখতে পায়, এই বিনিয়োগ টাটা'র জন্য লাভজনক।

তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, মি. রতন টাটা আগেভাগেই কি করে বুঝলেন এই বিনিয়োগটি তার কোম্পানির জন্য ভাল হবে? কোন প্রকার গভীর বিশ্লেষণ না করেই কিভাবে তিনি একটি সরকারকে এই রকম একটি বড় প্রতিশ্রুতি দিতে পেরেছিলেন?

টাটা'র এই বিনিয়োগটি যদিও পরবর্তীতে বাতিল হয়ে যায়, কিন্তু তা মূলত হয় খুব সম্ভবত রাজনৈতিক কারণে। অন্য কোন কারণে নয়।

শুধুমাত্র ইনট্যুশনের উপর ভিত্তি করে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেয়া ব্যক্তিদের তালিকায় যেমন বাংলাদেশ এবং বিদেশের খ্যাতনামা ব্যবসায়ীরা রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন রাস্তার ধারের মুদির দোকানিরাও। এই ব্যাপারটিতে অনেক অবাক হলেও ব্যবসায়িক সার্কেলে এটি যে একটি খুবই সাধারণ একটি ঘটনা, তা আগেই বলা হয়েছে।

এই ধরণের সিদ্ধান্ত সব সময়ই যে সঠিক হয়, তা নয়। অনেক সময়ই এই ধরণের সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হয়। কিন্তু তাই বলে বিশ্বের তাবত ব্যবসায়ীরা এই কায়দায় বড় বড় বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে এখন পর্যন্ত দুরে সরে যাননি।

নীতিনির্ধারণী দক্ষতা

সাইফুর রহমানকে সঠিকভাবে চিনতে হলে সবার আগে আলোচনা করতে হবে তার নীতিনির্ধারণী দক্ষতা নিয়ে। তার নেয়া অনেক নীতির সুফল আজ জাতি ভোগ করছে, অনেক সুফল আমরা আজ নিজেদের চোখে দেখতে পাচ্ছি।

তার মৃত্যুর পর এই সকল কল্যাণকর নীতির প্রশংসা অনেকেই করেছেন। তাই এই ব্যাপারে নতুন কোন আলোচনার অবকাশ নেই।

তবে তার অন্তত একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত ছিল যার ফলাফল আসলে চট করে চোখে দেখা যায় না বা অনুধাবন করা যায় না।

এই সিদ্ধান্তটি ছিল সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস (সিবিওয়্যার) সংক্রান্ত।

অনেকের হয়তো মনে আছে, ২০০৪ সালের শেষের দিকে সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউসের অনুমোদন দেয়া নিয়ে বিজিএমইএ এবং বিটিএমএ'র মধ্যে একটি বিতর্কের সুত্রপাত হয়। বিজিএমইএ নের্তৃবৃন্দ বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করে সিবিওয়্যার অনুমোদন দেয়ার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। আর বিটিএমএ নের্তৃবৃন্দের অবস্থান ছিল সিবিওয়্যার অনুমোদন দেয়ার বিপক্ষে।

তাই এই বিবাদ নিরসনে তৎকালীন সরকার একটি কমিটি গঠন করে।

এই কমিটি সিবিওয়্যার অনুমোদন দেয়ার পক্ষে তার মতামত প্রদান করে।

কিন্তু পরবর্তীতে সাইফুর রহমানের নের্তৃত্বাধীন কেবিনেট কমিটি সিবিওয়্যার অনুমোদন না দেয়ার পক্ষে অবস্থান নেয়। ফলে দেশে আর কোন সিবিওয়্যার প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সেই সময়ে আমি ঢাকার একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষক হিসাবে কর্মরত ছিলাম। আমার তখন সুযোগ হয়েছিল এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করার। পরবর্তীতে আমি বিষয়টি নিয়ে বাংলায় একটি রচনাও লিখেছিলাম।

আমি আজ গবেষণাটির একটি কপি এবং বাংলায় লেখা সেই রচনাটি আইএফডি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করছি। আগ্রহী পাঠকরা এই দুটি আর্টিকেল পড়তে চাইলে ভিজিট করুন http://www.ideasfd.org/New%20Papers.htm ওয়েবপেজটিতে।

আগ্রহী পাঠকদেরকে বিনীত অনুরোধ করব এই দুটি গবেষণাধর্মী আর্টিকেল মন দিয়ে পড়ার জন্য। এই দুটি আর্টিকেল পড়লে তারা লক্ষ্য করবেন আজ থেকে প্রায় ছয় বছর আগে আমি প্রচুর তথ্য উপাও বিশ্লেষণ করে বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম। তারা এটাও বুঝবেন, বিজিএমইএ নের্তৃবৃন্দের প্রবল চাপের মুখেও নতি স্বীকার না করে মরহুম সাইফুর রহমানের সিবিওয়্যার অনুমোদন না দেয়ার তখনকার সিদ্ধান্তটি কতটা ভিশনারি ছিল।

সাইফুর রহমানের আত্মপ্রচার

মরহুম সাইফুর রহমানের আত্মজীবনীটি পড়লে অনেকেই মনে করতে পারেন তিনি আত্মপ্রচারের দোষে দুষ্ট। তিনি তার বইয়ে তার সাফল্যের অনেক ফিরিস্তি দিয়েছেন, কিন্তু তার ব্যর্থতার দিকগুলি নিয়ে খুব একটা আলোচনা তিনি করেননি।

কিন্তু আমি বলব, আত্মপ্রচার একজন অর্থমন্ত্রীর প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য এবং তিনি সেটাই করেছেন। এখানে কোন ভুল হয়নি।

এর কারণ, একটি অর্থনীতি ভাল চলবে, নাকি খারাপ চলবে তার অনেকখানিই নির্ভর করে সেই অর্থনীতিতে জনগণের আস্থার উপর। সেই আস্থা যদি না থাকে, তাহলে অনেক চেষ্টা করেও অর্থনীতির গতি বাড়ানো সম্ভব নয়।

আর যেহেতু একজন অর্থমন্ত্রী দেশের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় অভিভাবক, সেহেতু তার অর্থনৈতিক সাফল্যের ফিরিস্তি সর্বপ্রথম তাকেই আগ বাড়িয়ে বলতে হবে। দেশে যদি

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হতে থাকে, বিনিয়োগ বাড়তে থাকে, মুদ্রাস্ফীতি কমতে থাকে, তাহলে সবার আগে এই তথ্যগুলি প্রচারের দায়িত্ব খোদ অর্থমন্ত্রীরই। তিনি যদি তা করেন, তাহলে অর্থনীতির উপর সকলের আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তার প্রতিফলন ঘটে সার্বিক অর্থনীতির গতি প্রকৃতিতেই।

শেষ কথা

সাবেক অর্থ এবং পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান যেভাবে আঞ্চলিকতাকে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা বোধকরি আর কোন জাতীয় নেতাই করতে পারেননি। আঞ্চলিকতা ছিল তার চরিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং অনেকেই এই বিষয়টিকে বাঁকা চোখে দেখলেও কিংবা এই বিষয়টি নিয়ে হাসি ঠাট্টা করলেও তিনি তার চরিত্রের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে কখনোই ত্যাগ করেননি। এর থেকে তার আত্মবিশ্বাসের মাত্রা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়।

জাতিগত পরিচয়ের সাথে আঞ্চলিক পরিচয় পারস্পরিক জড়িত এবং একটি ছাড়া আরেকটি অচল। অথচ আজ নগরজীবনে অভ্যস্ত অনেকেই তাদের আঞ্চলিক পরিচয় ত্যাগে কুণ্ঠাবোধ করেন না। এই কারণে দেখা যায় নতুন প্রজন্মকে আঞ্চলিক ভাষা শেখানোর ব্যাপারেও কার্পণ্য লক্ষ্য করা যায় অনেক বাবা-মায়ের ক্ষেত্রেই।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আঞ্চলিক পরিচয়ে পরিচিত হতে কুণ্ঠাবোধকারী এই নতুন প্রজন্মের মধ্যেই আত্মপরিচয়ের সঙ্কটটা সবচেয়ে বেশি। তারা যেমন নিজেদের শেকড় কোথায় তা জানে না, তেমনি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল এবং কম্পিউটারের যুগে নিজেদের বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি ত্যাগ করে বিজাতীয় ভাষা এবং সংস্কৃতিকে আপন করে নেয়ার প্রবণতাও এদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি।

অথচ এদের বোঝা উচিত জাতীয় পরিচয়ের বাইরে আঞ্চলিক পরিচয়কে ধরে রাখার প্রবণতা সারা বিশ্বেই প্রচলিত। পাশ্চাত্যে ইংরেজি ভাষার অনেক মুভি নির্মিত হয়েছে পুরোপুরি আঞ্চলিক ইংরেজি ভাষার উপর ভিত্তি করে। এই রকম একটি জনপ্রিয় মুভি হল **ব্রেভহার্ট** (Braveheart) যা অনেকেই দেখেছেন। এই মুভিটির প্রায় পুরোটাই তৈরি হয়েছে স্কটিশ ভাষার উপর নির্ভর করে যা মুল ইংরেজি ভাষা থেকে কিছুটা ভিন্ন।

আমাদের বাংলাদেশের মতই ইউএসএ'র একেক স্টেটের ইংরেজি ভাষার উচ্চারণে ভিন্নতা রয়েছে এবং সেই সকল স্টেট থেকে যে সকল সিনেটর কংগ্রেসে নির্বাচিত হন, তাদের

অনেকের বক্তব্য-বিবৃতিতে এই আঞ্চলিক পরিচয় প্রতিফলিত হয় ঠিক যেমন প্রতিফলিত হত সাইফুর রহমানের বেলায়।

আজ বাংলাদেশের বিভিন্ন মিডিয়ায় আঞ্চলিক সংলাপ নির্ভর অনেক নাটক প্রচারিত হচ্ছে। অনেক বিজ্ঞাপন তৈরি হচ্ছে পুরোপুরি আঞ্চলিক ভাষায়। এর কারণটি মূলত বাণিজ্যিক। যারা বিভিন্ন প্রকারের পণ্য তৈরি করছেন, তারা বুঝতে পারছেন যে ঢাকার বাইরেও এক বিরাট মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে যাদের কাছে পৌঁছাতে হলে আঞ্চলিকতাকে বরণ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

অথচ আজ থেকে প্রায় এক যুগ আগে এই প্রবণতা খুব একটা ছিল না। তখন একমাত্র সাইফুর রহমানকেই দেখা যেত আঞ্চলিক টানে জাতীয় পর্যায়ে কথাবার্তা বলতে। তাই আজকে আঞ্চলিকতাকে বরণ করার যে ধারা দেখা যাচ্ছে, তার পরিবেশ তৈরির কাজটা শুরু করেছিলেন সাবেক অর্থ এবং পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. সাইফুর রহমান, এই কথা নিশ্চয়ই আজ সবাই স্বীকার করবেন।

*****

একদল ব্যক্তি দেখা করতে গেছেন সাইফুর রহমানের বাসায় কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলতে।

তিনি তাদেরকে দেখেই ক্ষেপে গেলেন। বললেন, "তোমরা যাও। আমি এখন ব্যস্ত। তোমরা সয়টার পরে আস।" (তোমরা সন্ধ্যা ছয়টা'র পরে আস)।

ব্যক্তিবর্গ ধমক খেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে বাইরে বের হয়ে আসলেন। তারা বুঝতে পারলেন না মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাদেরকে এই গরমের দিনে সোয়েটার পরে আসতে বললেন কেন!

ছবিসূত্রঃ ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত। মরহুম সাইফুর রহমানের এই অনন্য পোট্রেটটির মূল আলোকচিত্রীর নাম পাওয়া যায়নি বলে দেয়া সম্ভব হল না।

লেখকের নিজের কথা

জন্মস্থান বাংলাদেশের সিলেট জেলা। বর্তমানে সৌদি আরবে একটি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিংয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স সম্পন্ন করেন যথাক্রমে ১৯৯৯ এবং ২০০০ সালে। পাশ করার সাথে সাথেই ঢাকা'র সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগে (সিপিডি) ইন্টার্ন হিসাবে গবেষণা জীবনের শুরু।

পরবর্তীতে আবারো মাস্টার্স করতে পাড়ি জমান ইউএসএ'তে। এবারের গন্তব্য ইউনিভার্সিটি অফ মেরিল্যান্ড – কলেজ পার্ক। সেখান থেকে ফিন্যান্সে মাস্টার অফ সাইন্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন ২০০২ সালে।

ফিরে আসেন আবার বাংলাদেশে ২০০৩ এর শেষের দিকে। পুনরায় যোগ দেন গবেষণা কাজে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময় থেকে পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হলেও লেখক হিসাবে পূর্ণ আত্মপ্রকাশ ঘটে সাপ্তাহিক ***'যায়যায়দিন'*** পত্রিকার মাধ্যমে। ২০০৪–২০০৬ সময়কালে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, এবং নীতিহীনতা নিয়ে তার একাধিক রচনা সাপ্তাহিক যায়যায়দিনে প্রকাশিত হয়েছে। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক জার্নালে তার একাধিক গবেষণা প্রবন্ধও রয়েছে।

মি. মাবরুর মাহমুদ বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক। অবসর সময়ে তিনি টিভি দেখেন, গবেষণা করেন, ইন্টারনেট ব্রাউজ করেন, এবং পরিবারের সাথে সময় কাটান।

আইএফডি পরিচিতি

Ideas for Development (IFD) একটি ভারচুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাংক (Virtual Think Tank)। এর মুল ধারণার প্রকাশ ঘটে ২০০৭ সালের জানুয়ারী ১৮ তারিখে একটি ইমেইলের মাধ্যমে। এই থিঙ্ক ট্যাংকটির কোন অফিস নেই। এর ওয়েব এবং ইমেইল এড্রেসই এর ঠিকানা। এই থিঙ্ক ট্যাংকটির উদ্যোক্তা সৌদি আরব প্রবাসী মি. মাবরুর মাহমুদ। তিনি একজন বাংলাদেশি নাগরিক। আইএফডি তারই চিন্তার ফসল।

এই ভারচুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাংকটির মুল উদ্দেশ্য ইন্টারনেটের শক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন উন্নয়নমুলক আইডিয়ার আদান প্রদানের মাধ্যমে দেশ, জাতি এবং সর্বোপরী মানবতার সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা। এটাই এই থিঙ্ক ট্যাংকটির মিশন স্টেটমেন্ট।

এই মিশন স্টেটমেন্ট প্রতিফলিত হয়েছে এই থিঙ্ক ট্যাংকটির লোগোতেও। এর লোগোতে চার রঙের ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে। এই চারটি রঙের মাধ্যমে বিশ্বের চারটি জাতি বা রেসকে (Race) বোঝানো হয়েছে। আইএফডি বিশ্বাস করে বর্তমান বিশ্বে যে অস্থিরতা এবং অশান্তি রয়েছে, তার মুলে রয়েছে জাতিগত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য। তাই আমরা বিশ্বাস করি এই নানাবিধ বৈষম্য যদি দুর করা যায়, তাহলে বিশ্বে অস্থিরতা অনেক কমে আসবে।

কিন্তু বৈষম্য কমানোর জন্য চাই নতুন নতুন উন্নয়ন আইডিয়া। বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর জাতিগুলি বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে নিত্যনতুন উন্নয়ন আইডিয়া তৈরি করছে এবং তার সফল বাস্তবায়ন করে দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্বল্পন্নোত দেশগুলি সম্পদ কম থাকার কারণে বা সম্পদের যথেচ্ছ অপব্যবহারের কারণে এই প্রতিযোগিতায় দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। ফলে উন্নত এবং উন্নয়নকামী দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান বাড়ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে দারিদ্র্য এবং শোষণ।

বিভিন্ন আইডিয়া উদ্ভাবনের মাধ্যমে জাতিগত এই ব্যবধান কমানোর একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আইএফডির সৃষ্টি। আইএফডি বিশ্বের সকল চিন্তাশীল এবং উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী মানুষদের আইডিয়া আদান প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হতে চায়। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চিন্তাশীল মানুষরা তাদের আইডিয়ার আদান প্রদান করবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আইএফডির মাধ্যমে আইডিয়া আদান প্রদান করলে একজন উদ্ভাবক বেশ কয়েকটি সুবিধা পাবেন।

প্রথমত, উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য আইডিয়া তৈরি করাই শেষ কাজ নয়, বরং এটি পুরো প্রক্রিয়াটির শুরু মাত্র। একজন উদ্ভাবককে শুধু আইডিয়া তৈরি করলেই চলবে না, বরং একটি সমস্যার চুলচেরা বিশ্লেষনের মাধ্যমে তার নতুন আইডিয়াটি দিয়ে সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করা যাবে তা উপস্থাপন করতে হবে একটি মডেলের আকারে। সেই মডেল আবার বাস্তবায়নযোগ্যও হতে হবে। এর অন্যথা হলে সেই আইডিয়াটির আসলে কোন মূল্য নেই।

আমাদের চারপাশে নতুন আইডিয়া দেয়ার লোকের আসলে কোন অভাব নেই। তবে একটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত এবং সর্বোপরী বাস্তবায়নযোগ্য আইডিয়া প্রণেতার সঙ্কট সর্বত্রই।

এই সঙ্কট সমাধানকল্পে আইএফডি একজন উদ্ভাবককে তার আইডিয়া সুন্দরভাবে উপস্থাপনের পথ দেখিয়ে দেবে। এক্ষেত্রে আইএফডি সম্ভব সবরকম গাইডেন্স প্রদান করবে এবং একটি সম্ভাবনাময় অথচ অপরিপক্ক আইডিয়াকে পরিপূর্ণ করতে সকল ধরনের সহায়তা প্রদান করবে।

দ্বিতীয়ত, আইএফডিতে আইডিয়া পাঠানোর জন্য কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। যে কোন ব্যক্তি যে কোন স্থান থেকে যে কোন মাধ্যমে আইএফডিতে আইডিয়া পাঠাতে পারেন।

তৃতীয়ত, বর্তমানে আইএফডি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক আইডিয়া আদান প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করলেও ভবিষ্যতে অন্যান্য অনেক বিষয়ও ধীরে ধীরে এর কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

চতুর্থত, আইএফডির মাধ্যমে কোন আইডিয়া প্রচার করা হলে সেই আইডিয়াটি যে একটি সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, সে ব্যাপারে সকলেই নিশ্চিত থাকবেন। ফলে আইডিয়াটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। এখানে বলে রাখা দরকার, আইএফডি যে কোন আইডিয়া পেলেই তা প্রচার করবে না। বরং একটি আইডিয়ার মাধ্যমে সমাজ কতটুকু উপকৃত হতে পারে, সেটাই হবে আইডিয়া নির্বাচন করার মূল ভিত্তি।

এবং পঞ্চমত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল, আইএফডিতে আইডিয়া পাঠাতে হলে উদ্ভাবককে কোন খরচ করতে হবে না, শুধুমাত্র পোস্ট কিংবা ইমেইলের খরচ ছাড়া। এই আইডিয়া যদি প্রচারযোগ্য হয়, তাহলেও উদ্ভাবককে কোন প্রকার ফি বা চার্জ দিতে হবে না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কোন এক চিন্তাশীল ব্যক্তি কোন সম্ভাবনাময় আইডিয়া দিলে তা চুরি হয়ে যেতে পারে। ফলে একজন আইডিয়ার উদ্ভাবক বঞ্চিত হবেন তার যথাযথ স্বীকৃতি থেকে।

এক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আইএফডির কাছে কেউ কোন আইডিয়া পাঠালে তা উদ্ভাবকের অনুমতি ছাড়া অন্য কোথাও অন্য কোন নামে ব্যবহার করা হবে না। আমাদের মতে, শুধুমাত্র একজন আইডিয়ার কারিগরের পক্ষেই সম্ভব অন্য আরেকজন আইডিয়ার কারিগরকে যথার্থ মূল্যায়ন করা।

আইএফডি বিশ্বাস করে একটি আইডিয়ার প্রকৃত মুল্যায়ন হয় তখনই যখন তা আংশিক বা পুর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং তা মানুষের কাজে লাগে। এ দিক থেকে আইএফডির একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ অনেক উন্নয়নমূলক আইডিয়ার সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার সহ অন্যান্য অনেক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তাই আইএফডি এমন কোন নিশ্চয়তা দিতে পারবে না যে আইএফডির মাধ্যমে কোন সম্ভাবনাময় আইডিয়া প্রচার হলেই তার সফল বাস্তবায়ন হবে। আইএফডি শুধু আইডিয়া তৈরি এবং প্রচারের প্ল্যাটফর্ম হিসাবেই কাজ করবে। এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব আইএফডির নয়।

তবে আইএফডির কার্যক্রম শুধুমাএ আইডিয়া তৈরি এবং তার প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। আইডিয়া তৈরি এবং তার সফল বাস্তবায়নের জন্য যেমন প্রয়োজন চিন্তাশীল মানুষ, তেমনি প্রয়োজন সঠিক রাজনৈতিক নের্তৃত্ব, বলিষ্ঠ সরকার কাঠামো, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সর্বোপরী একটি শান্তিপুর্ণ রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশ। উপযুক্ত পরিবেশ না থাকলে চিন্তাশীল মানুষের যেমন জন্ম হবে না, তেমনি অস্থিতিশীল সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশে চিন্তাশীল মানুষদের উন্নয়ন আইডিয়ার যথার্থ মুল্যায়ন এবং বাস্তবায়নও হবে না।

তাই উন্নয়ন আইডিয়া প্রচারের পাশাপাশি আইএফডি এমন একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করবে যার মাধ্যমে যেন সমাজে সৃষ্টিশীল মানুষদের সংখ্যা বাড়ে, তাদের যথার্থ মুল্যায়ন হয় এবং তাদের আইডিয়ার সফল বাস্তবায়ন হয়। এই লক্ষ্যে আইএফডি বিভিন্ন ইস্যুতে তার মতামত ব্যক্ত করবে এবং বিভিন্ন রচনা প্রচার করবে।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, আপনি যদি আপনার কোন আইডিয়া নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হোন, এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন এই আইডিয়াটি বাস্তবায়িত হলে সমাজের কিছু কল্যাণ সাধিত হবে, তাহলে আইডিয়াটি আমাদেরকে লিখে পাঠান। এর জন্য প্রাথমিকভাবে ইমেইল করুন আমাদের ঠিকানায়। আমাদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট।

আমাদের বিশ্বাস এই ধরণের আইডিয়া আদান প্রদানের মাধ্যমে সর্বএ নতুন নতুন চিন্তাশীল মানুষের বিকাশ ঘটবে। তাদের চিন্তালব্ধ আইডিয়ার সফল বাস্তবায়ন হলে লাভবান হবেন সকলেই। তাই এর জন্য প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা। আইএফডির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক আইডিয়া প্রচারের জন্য যে কোন প্রকার সহযোগিতাকে তাই আমরা স্বাগত জানাই।

©Ideas for Development
ideasfd@gmail.com
www.ideasfd.org

[Keyword for Websearch: Saifur Rahman, Finance Minister of Bangladesh, Budget in Bangladesh, IFD Special Article]